SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

বাংলার অবহেলিত লোকায়ত সমাজের অগ্রদূত

শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর

নৃপেন বিশ্বাস

সারসংক্ষেপঃ

ষোড়শ শতকের বাংলার নবজাগরণ ঘটেছিল শ্রী চৈতন্যদেবের মাধ্যমে। উনবিংশ শতাব্দীতে কোলকাতা কেন্দ্রীক নবজাগরণের নেতা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এই উনবিংশ শতাব্দীতেই গ্রাম বাংলার অনগ্রসর শ্রেনীর মধ্যে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল সেই নবজাগরণের অগ্রদূত শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর।

গীতায় বলা হয়েছে যে, যখনই দেশে অধর্মের বন্যা বয়ে যায়, তখনই একজন মহাপুরুষ এসে মানব সমাজকে সঠিক পথে চালিত করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর তেমনই উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলাদেশে যখন অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রভৃতি অনাচারে বাঙালি সমাজ তথা ভারতীয় সমাজ জীবন নিপীড়িত হচ্ছিল তখনই আবির্ভূত (১৮১২-১৮৭৮) হয়ে ভারতকে নতুন পথে পরিচালিত করার সঠিক নির্দেশ দিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর তার দেখানো পথেই বাংলার অনগ্রসর শ্রেনীর মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল।

বিভিন্ন কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে হরিচাঁদ ঠাকুর মতুয়া সামাজ নামে এক সম্প্রদায় তৈরি করেন এবং অনগ্রসর ও নিপীড়িত মানুষকে মুক্তির পথ দেখান। তাঁর মতাদর্শ দ্বাদশ আজ্ঞা নামে পরিচিত।এই আজ্ঞা গুলি হল- ১) সদা সত্য কথা বল। ২) পরস্ত্রীকে মাতৃ জ্ঞান কর। ৩) মাতা পিতাকে ভক্তি কর। ৪) জগতকে প্রেম দান কর। ৫) চরিত্র পবিত্র ব্যক্তির

প্রতি জাতিভেদ কর না। ৬) ষড়রিপুর নিকট সাবধান থাকিবে। ৭) কাহারও ধর্ম নিন্দা করিও না। ৮) বাহ্য অঙ্গ সাধুসাজ ত্যাগ কর। ৯) হাতে কাজ মুখে নাম কর। ১০) শ্রীহরি মন্দির প্রতিষ্ঠা কর। ১১) ঈশ্বরকে আত্মদান কর। ১২) দৈনিক প্রার্থনা কর। এই আজ্ঞা গুলি বৌদ্ধ দর্শনের পঞ্চশীল ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ এর অনুরূপ। এই দ্বাদশ আজ্ঞা ছাড়ও তাঁর অন্যতম আদর্শ হচ্ছে "জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা"। জীবকে সেবা করলেই ভগবানকে সেবা করা হয়। এটা হচ্ছে তাঁর অন্যতম আদর্শ।

স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন "জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের মতে জীবকে সেবা করলেই ঈশ্বরকে সেবা করা হয়। এই জন্য তাঁর পুত্র শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অনগ্রসর মানুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া, সরকারি চাকুরীতে প্রবেশ করানো প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে জীবসেবার মহান আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গিয়েছেন। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের সুদূরপ্রসারি ও বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা শুধু ভারতবর্ষের অনগ্রসর শ্রেনীকে নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীকে যে পথ দেখাতে সক্ষম তা তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

সূচকশব্দ: নবজাগরণ, দলিত, মতুয়া, সংস্কার ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে সংঘাত ও মিলনের মাধ্যমে কোলকাতাকে কেন্দ্র করে রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম, নিউ হিন্দু মুভমেন্ট, ইয়ং বেঙ্গলদের আন্দোলন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, বেথুন সাহেব, ডেভিড হেয়ারের অবদান অনস্বীকার্য। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজধানী কোলকাতাকে কেন্দ্র করে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়। এই কলকাতা

কেন্দ্রিক নবজাগরণ ছিল শহরকেন্দ্রিক, শহরের বাইরে পল্লী বাংলায় যেখানে দেশের নব্বই শতাংশ নিপীড়িত দলিত মানুষ বসবাস করেন সেখানে এর প্রভাব পড়েনি।[১]

উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে জাগরণ ঘটে। অবিভক্ত বঙ্গে মতুয়া আন্দোলন কে কেন্দ্র করে নানারকম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন এবং সাহিত্য সাংস্কৃতিক কর্ম প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ষোড়শ শতকে বাংলার নবজাগরণ ঘটেছিল শ্রী চৈতন্যদেবের মাধ্যমে। উনবিংশ শতাব্দীতে কোলকাতা কেন্দ্রীক নবজাগরণের নেতা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এই উনবিংশ শতাব্দীতেই গ্রাম বাংলার অনগ্রসর শ্রেনীর মধ্যে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল সেই নবজাগরণের অগ্রদূত শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর।

গীতায় বলা হয়েছে যে, যখনই দেশে অধর্মের বন্যা বয়ে যায়, তখনই একজন মহাপুরুষ এসে মানব সমাজকে সঠিক পথে চালিত করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর তেমনই উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলাদেশে যখন অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রভৃতি অনাচারে বাঙালি সমাজ তথা ভারতীয় সমাজ জীবন নিপীড়িত হচ্ছিল তখনই আবির্ভূত (১৮১২-১৮৭৮) হয়ে ভারতকে নতুন পথে পরিচালিত করার সঠিক নির্দেশ দিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর তার দেখানো পথেই বাংলার অনগ্রসর শ্রেনীর মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল।

বিভিন্ন কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে হরিচাঁদ ঠাকুর মতুয়া সামাজ নামে এক সম্প্রদায় তৈরি করেন এবং অনগ্রসর ও নিপীড়িত মানুষকে মুক্তির পথ দেখান। তাঁর মতাদর্শ দ্বাদশ আজ্ঞা নামে পরিচিত।এই আজ্ঞা গুলি হল- ১) সদা সত্য কথা বল। ২) পরস্ত্রীকে মাতৃ জ্ঞান কর। ৩) মাতা পিতাকে ভক্তি কর। ৪) জগতকে প্রেম দান কর। ৫) চরিত্র পবিত্র ব্যক্তির প্রতি জাতিভেদ কর না। ৬) ষড়রিপুর নিকট সাবধান থাকিবে। ৭) কাহারও ধর্ম নিন্দা করিও না। ৮) বাহ্য অঙ্গ সাধুসাজ ত্যাগ কর। ৯) হাতে কাজ মুখে নাম কর। ১০) শ্রীহরি মন্দির প্রতিষ্ঠা কর। ১১) ঈশ্বরকে আত্মদান কর। ১২) দৈনিক প্রার্থনা কর। এই আজ্ঞা গুলি বৌদ্ধ দর্শনের পঞ্চশীল ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ এর অনুরূপ। এই দ্বাদশ আজ্ঞা ছাড়াও তাঁর অন্যতম আদর্শ হচ্ছে "জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা"। জীবকে সেবা করলেই ভগবানকে সেবা করা হয়। এটা হচ্ছে তাঁর অন্যতম আদর্শ।

স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন "জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের মতে জীবকে সেবা করলেই ঈশ্বরকে সেবা করা হয়। এই জন্য তাঁর পুত্র শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অনগ্রসর মানুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া, সরকারি চাকুরীতে প্রবেশ করানো প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে জীবসেবার মহান আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গিয়েছেন। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের সুদূরপ্রসারি ও বিজ্ঞানসম্মত

চিন্তাধারা শুধু ভারতবর্ষের অনগ্রসর শ্রেনীকে নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীকে যে পথ দেখাতে সক্ষম তা তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। অতি সংক্ষেপে তাদের কর্মজীবনের কিছু অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

নারী পুরুষের সাম্যের নীতি ও নারী শিক্ষাঃ

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মবাদী হিন্দু দর্শন নারীদের দেবীরূপে কল্পনা করেছে, মৃন্ময়ী মাতৃজ্ঞানে পুজো দিয়েছে। আবার সেই নারীকেই নরকের দ্বার বলেছে, সাধন ক্ষেত্রে নারী পরিত্যাজ্য বলে নারী বিহীন ব্রহ্মচারী জীবনযাপন করেছে। সর্বোপরি নারীদের পশুর অধম বলে গালিও দিয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে সংসার জীবনে নারীদের দাসী-বাদী করে রেখেছে, সন্তান জন্মদাত্রী যন্ত্র রূপে বন্দী করে রেখেছে। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর মনে করেন ব্রহ্মচর্য কিংবা সন্ন্যাস ও সকল রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী জীবনযাপন করতে গিয়ে যারা গৃহ ত্যাগ করে তারা জীবন চর্যায় ভুল তো করেই উপরন্তু নারীর প্রতি চরম অবমাননার পরিচয় দেয়। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের মতে এ সকল বর্ণাশ্রম প্রথা পালনের জন্য গৃহ, নারীসঙ্গ বা কায়িক শ্রম ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। গৃহে থেকেই চতুরাশ্রম প্রথা অনুযায়ী জীবন চর্যা করা যায় তাই হরিচাঁদ ঠাকুর বলেনঃ

"করিবে গৃহস্থ ধর্ম লয়ে নিজে নারী
গৃহে থেকে ন্যাসী বানপস্থী ব্রহ্মচারী"।। (শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃষ্ঠা ১১)

জগতের সমস্ত ধর্মই গৃহীকে এবং নারীকে ধর্ম সাধনার বাধা হিসেবেই চিহ্নিত করেছে। হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া ধর্ম আন্দোলনে সেই গৃহ এবং নারীকেই সর্বোচ্চে রেখেছেন। এই বাস্তব মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের যুগান্তকারী মতবাদ বা আদর্শই কেবল নয়, এ এক নতুনতর জীবন আদর্শ তথা বস্তুবাদ এর প্রতিষ্ঠা করেছে। তা সমাজ বিপ্লবের নতুন দিগন্ত কে চিহ্নিত করেছে।

গার্হস্থ্য ধর্ম তথা দাম্পত্য জীবনাচরণের এই আদর্শ, একে মানবতার চূড়ান্ত সার্থকতা বলেই হরিচাঁদ ঠাকুর উন্মোচন করেছিলেন। এই দাম্পত্য আচরণ বিধিকে আজ সারা পৃথিবী আইনে রূপান্তরিত করতে কতই না চেষ্টা করছে। তথাকথিত নারীবাদীরা বিশ্বজুড়ে আজ যে নারীবাদ বা মানবী চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করতে বিশ্বজুড়ে আন্দোলনে নেমেছেন, হরিচাঁদ ঠাকুর প্রায় ২০০ বছর পূর্বে এই সর্বশ্রেষ্ঠ সমতার মানবিক আন্দোলনের আকারে মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলেন এবং সেটা যে কত বড় বাস্তব সত্য তা মতুয়া মেলায় বর্ষ উৎসবে আগত মতুয়ারা দলে দলে নারীসহ যখন উপস্থিত হন তখন দেখা যায়। একজন নারী তার মানবী চেতনার মানবিক সমতায় উত্তীর্ণ হয়ে একটি সুসংগঠিত মতুয়া দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, পরিচালনা করছেন। তার পেছনে রয়েছে অসংখ্য পুরুষ ও নারী। এই নারীকে মতুয়া ধর্ম আন্দোলন নারী হিসেবে চিহ্নিত করেনি, মানুষ হিসেবে, মতুয়া হিসেবে নবজাগরণের প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

হরিচাঁদ ঠাকুর মনে করেন, নারীদের পুরুষের পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারলে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয় । "দশরথের প্রতি নায়েবের অত্যাচার ও কাছারি আখ্যানে নারী কাছারির উল্লেখ পাওয়া যায়। নারী কাছারির সে রায়ে অপরাধীর সাজা হয় ও হরিচাঁদ ঠাকুরের কৃপায় তার ভক্তের জয় হয়"।[২] শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছেন সমাজের অর্ধেক সংখ্যক নারীদের অচেতন রেখে সমাজ এগোতে পারে না, মানব সমাজের প্রকৃত উন্নতি হতে পারে না। অতএব নারীদেরও অবশ্যই শিক্ষিত করে তুলতে হবে। গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছেনঃ

“খাও বা না খাও তাতে কোন দুঃখ নাই।

ছেলে মেয়ে শিক্ষা দাও এই আমি চাই”।। (শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত পৃষ্ঠা ১৪৪)

নারীদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিলাম, কিন্তু ঘরে বন্দী করে রাখলাম, অন্যান্য মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখলাম- তা হবে না। তাদের পুরুষের সমান অধিকারও দিতে হবে। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর বলেছেন:

“সমাজে পুরুষ পাহে যেই অধিকার।

নারীও পাইবে তাহা করিলে বিচার”।।

গুরুচাঁদ ঠাকুরও পিতাকে সমর্থন করেছেন-

"শুনেছি পিতার কাছে আমি বহুবার।

নারী-পুরুষ পাবে সম অধিকার"।।

শুধুমাত্র এই বানী শুনিয়েই থেমে থাকেনি হরিচাঁদ ঠাকুর এবং গুরুচাঁদ ঠাকুর। এসব যাতে বাস্তবে, ধর্মে ও কর্মে প্রকৃত রূপ পায় তার ব্যবস্থা করেছেন। তালতলা গ্রামসহ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বহু বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। অসহায় দুর্বল নারীরা যাতে স্বয়ম্বর হতে পারে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তার জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুর শতবর্ষ পূর্বে ওড়াকান্দিতে নারী ট্রেনিং স্কুল খুলেছিলেন। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় হরিচাঁদ ঠাকুর প্রবর্তিত ও গুরুচাঁদ ঠাকুর সংগঠিত মতুয়া ধর্মের সমাজ সংস্কারের যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত হলো নারী পুরুষের সাম্যের নীতি, নারীর শিক্ষা ও আত্ম উপলব্ধি।

শিক্ষা সংস্কারঃ

"শিক্ষিত হও সংগঠিত গঠিত হও ও আন্দোলন কর" (Education, Organise, Agitate)

আমরা জানি এই স্লোগানটি বাবাসাহেব আম্বেদকরের। কিন্তু তার বহু পূর্বে এই একই স্লোগান দিয়েছিলেন শিক্ষার অগ্রদূত শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর।

"বিদ্যা হীন সমাজের কোন গতি নাই।

বিদ্যা শেখো বিদ্যা শেখো বলিলেন তাই।। (Education)

সভাকর সভাকর প্রভুজি হাঁকিল। (Organise)

ঘরে ঘরে আন্দোলন প্রয়োজন হল"।। (Agitate) (শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত পৃষ্ঠা ১১৩)

মহাকবি মহানন্দ হালদারের কাব্যের ছন্দের মধ্যে দেখতে পাই- শিক্ষা আন্দোলন, সংঘ বা সংগঠনের নির্মাণ, যেটা পূর্বেই হরিচাঁদ ঠাকুর মতুয়া নাম দিয়ে সকলকে সংগঠিত করেছিলেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর সেই সংগঠনের উপর দাঁড়িয়ে আন্দোলন করার জন্য তৈরি করেছিলেন নমঃশূদ্র, মতুয়া তথা পিছিয়ে রাখা শ্রেণীকে।

তিনি আরো বলেন

"নমঃশূদ্রকূলে জন্ম হয়েছে আমার,

তবু বলি আমি নহি নমঃর একার।

সবারে বলি আমি যদি মান মোরে,

অবিদ্বান পুত্র যেন নাহি থাকে ঘরে।

খাও বা না খাও তাতে দুঃখ নাই,

ছেলেপিলে শিক্ষা দাও এই আমি চাই"।

এই বার্তা গুরুচাঁদ ঠাকুর বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন। ডেকে ডেকে সবাইকে নিজ নিজ গ্রামে বিদ্যালয় তৈরি করতে বললেন। ঠাকুরের প্রেরণায় নমঃশূদ্রগণ বিভিন্ন জেলায় বিশেষত ফরিদপুর, খুলনা, যশোর এবং বরিশাল জেলায় বিদ্যালয় তৈরি হতে লাগলো। তিনি বললেন বিদ্যালয় তৈরি না হওয়া পর্যন্ত গোয়াল ঘরে পড়ার ব্যবস্থা করবে। ভোরে গোয়াল ঘর থেকে গরু বের করে দিয়ে সেই ঘর পরিষ্কার করে ছেলে-মেয়েদের পড়বার ব্যবস্থা করবে।

ব্রাহ্মণ্যবাদী কুসংস্কারকে অবজ্ঞা করে গুরুচাঁদ ঠাকুর নমঃশূদ্র কূলে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন সংসার সুখের হয় রমণীর গুনে। মিড সাহেবের স্ত্রীও এই নারী শিক্ষার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ওড়াকান্দিতে তৈরি হয়েছিল নারী শিক্ষালয়। শ্রী গুরুচাঁদ চরিতের ৩৭১ পৃষ্ঠায় পায়:

নারী শিক্ষা দিতে প্রভু ব্যস্ত সর্বদায়,
ওড়াকান্দি তাতে হল নারী শিক্ষা লয়।

এছাড়াও তিনি মিড সাহেবের প্রচেষ্টায় সকলের জন্য অসংখ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ:

হরিচাঁদ ঠাকুর যখন এসেছিলেন অবতার রূপে এই ধরাধামে তখন সমগ্র বিশ্ব বিশেষত ভারত বর্ষ ছিল পরাধীন এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। এদেশ ছিল বিদেশি ধর্মান্তকারীদের দাপটে, তাদের

ধর্মীয় আচ্ছাদনে। মুসলিম ধর্মের আতিশয্য এবং খ্রিস্টান ধর্মের শাসনে। হিন্দুধর্ম ছিল সামাজিক অধিকারে একদম কোণঠাসা। হিন্দু ধর্মে ছিল প্রচুর শ্রেণীবিভাগ এবং জাতিগত বিভাজন। মুসলিম ধর্ম এবং খ্রিষ্টান ধর্মের মানুষদের অত্যাচারে হিন্দুরা হয়েছিল শোষিত, হয়েছিল দুর্বল এবং নিঃস্ব। এই সুযোগে একশ্রেণীর হিন্দু যারা উচ্চবর্ণ হিসেবে গণ্য ছিল হিন্দু সমাজে তারা রাজ দরবারে তোষামোদ করে স্থান করে সসন্মানে জীবন যাপন করতেন। এরাই আবার দুর্বল হিন্দুদের দাসত্ববৃত্তি করাতে কুণ্ঠিত হয়নি বরং এই নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের উপর এইসব উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার ও শোষণ ছিল মর্মান্তিক। এই নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নমঃশূদ্ররা। উচ্চ বর্গের মানুষদের মধ্যে ছিলেন প্রথমে ব্রাহ্মণ, পরে কায়স্থ এবং বনিয়ারা। কায়স্থ এবং বনিয়ারা পরোক্ষভাবে শোষণ করতেন নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের। এ প্রসঙ্গে আমরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করতে পারি। তিনি মানুষকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন:

“হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান”।

জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা:

হরিচাঁদ ঠাকুর নিজে যে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, বৈদিক বিধানকে অস্বীকার

করেছিলেন " বেদ বিধি শৌচাচার নাহি মানি" এর মধ্যে দিয়ে। হরিচাঁদ ঠাকুর প্রণীত মতুয়া দর্শনের মূলনীতি হল:

"জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা,

ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা" (শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃষ্ঠা ১১)

গুরুচাঁদ ঠাকুরও পিতার আজ্ঞা ও আদেশ কে শিরোধার্য করে দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই জাতিভেদ প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তার মতে জাতিভেদ প্রথা হচ্ছে কোন সমাজ ও দেশের ক্ষেত্রে মারণ ব্যাধি স্বরূপ। তাই তো তিনি বলেছেন:

"মানুষে মানুষে বল ভিন্ন জাতি কোথা?

নরজাতি এক জাতি ভেদ করা বৃথা"। (শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত পৃষ্ঠা ৩৬০)

গুরুচাঁদ ঠাকুর সমাজে জাতিভেদ প্রথার ওপর কুঠারঘাত করে বলেছেন:

"নমঃশূদ্র কূলে জন্ম হয়েছে আমার।

তবু বলি আমি নাহি নম:র একার"। (শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত পৃষ্ঠা ১৪৪)

এখানে গুরুচাঁদ ঠাকুরকে কেন এই কথা পরিষ্কার করতে হচ্ছে- তিনি শুধু নম:র নন? বৈদিকবাদিরা কখনোই চান না অন্য সমাজ থেকে কেউ উপরে উঠে আসুক। তাই হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুরের উপর অপবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র নম:দের জন্য কাজ করছেন। তারা নম:র ভগবান। এখানেও জাতিবাদের মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা হরি-গুরুচাঁদের জীবনদর্শন ও কর্মের যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো তাদের কর্মধারা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য ছিল, বিশেষ কোনো এক জাতির জন্য নয়। তার প্রমাণ আমরা পাই:

"নরাকারে ভূমন্ডলে যতজন আছে।

এক জাতি বলে মান্য পাবে মোর কাছে"।। (শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত পৃষ্ঠা ২০১)

এই বিশ্বে যত মানুষ আছে তারা সকলে আমার কাছে এক জাতি অর্থাৎ মানব জাতি বলে মান্যতা পাবে। প্রশ্ন হচ্ছে এই স্বীকারোক্তি বারবার কেন করতে হচ্ছে? কারণ, বৈদিকবাদী জাত ব্যবস্থা দেশ ও সমাজকে এমনভাবে বিভক্ত করেছে যে, কারো পরিচয় জানার পূর্বে তার জাত (cast) সম্পর্কে জানা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুরুচাঁদ ঠাকুর বৈদিকবাদীদের জাতিভেদ ব্যবস্থার উপর কুঠারঘাত করে জানিয়ে দিয়েছেন- বিশ্বের সকল মানুষ তার কাছে এক জাতি হিসেবেই মান্যতা পাবে।

"মতুয়া সকলে এক, জাতি-ভেদ নাই"।

বিশেষত: কন্যা হলে নাহিক বালাই”।।(শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত পৃষ্ঠা ২০১)

তিনি সকলকে নির্দেশ দিতেন মতুয়ারা সকলে এক, তাদের মধ্যে কোন জাতিভেদ যেন না থাকে। আর মতুয়া সমাজে কন্যা বা নারীর স্থান সবার ঊর্ধ্বে। কোন প্রকার নারী-পুরুষ বা জাতিগত বৈষম্য চলবে না।

রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা:

ধনহীন বিদ্যাহীন যারা এই ভবে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা শান্তি নাহি পাবে।।

আত্মন্নত অগ্রভাগে প্রয়োজন তাই।

বিদ্যা চাই, ধন চাই,রাজকার্য চাই।। (শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত পৃষ্ঠা ৫৭৩)

এই উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুর একটি সংকেত দিয়ে গেছেন যে, আপনাকে শুধু শিক্ষিত ও সম্পদশালী হলেই চলবে না, রাজনৈতিক ক্ষমতাও দখল করতে হবে। কারণ, সেখানেই শাসন ব্যবস্থার ও দেশের প্রগতির সব ক্ষমতা গচ্ছিত আছে। বিচার পরিবর্তন সব পরিবর্তনের মূল তেমনি সব রাজনীতি হচ্ছে সব ক্ষমতার উৎস। এই মৌলিক কথাকে কিন্তু গুরুচাঁদ ঠাকুর ভীষণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই ক্ষমতার উৎসে পৌঁছানোর জন্য যেসব উপকরণ একান্ত প্রয়োজনীয়

সেসব অর্জনের জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করেন। কারণ,সব বিদ্যাধন অর্জিত হলে আর্থিক ধনও এসে যাবে। তখন রাজনৈতিক অধিকারের জন্য সংগ্রামী লিপ্ত হওয়া যাবে। তিনি এই বিদ্যাহীনদের জাগানোর জন্য আরো জানিয়েছেন যে, পৃথিবীর কোণে কোণে যদি প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, যারা বিদ্যা ও অর্থ ধনে ধনী নয়, তারা কখনোই দেশের পরিচালনায় মুখ্য দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেনা। আর যদিও কোন প্রকারে ওই ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহলে তারা সঠিকভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারবে না। তাই আত্মোন্নতির অগ্রভাগে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো বিদ্যালাভ করা। এই বিদ্যা লাভ করতে পারলে ধনও আসবে আর দেশ পরিচালনার জন্য ক্ষমতার অধিকারীও হওয়া যাবে। এক কথায় সব সমস্যার সমাধানের চাবি হচ্ছে শিক্ষিত হওয়া। সেই শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনই নয়, সঙ্গে সামাজিক শিক্ষায়ও শিক্ষিত হতে হবে। তা না হলে কোন ক্ষেত্রে শান্তি আসবে না। তার মতে এই রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জিত হতে পারে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে। তাই তো তিনি বলেছেন,

“যে জাতির দল নাই, সে জাতির বল নাই।

যে জাতির নাই রাজা সে জাতি হয় না তাজা”।

সিদ্ধান্তঃ

সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, যে অর্থে শ্রীচৈতন্যদেব কে ষোড়শ শতকের নবজাগরণের নেতা বা রাজা রামমোহন রায় কে উনিশ শতকের নবজাগরণের নেতা বলে অভিহিত করা হয়, সেই অর্থে শ্রীশ্রী

হরিচাঁদ- গুরুচাঁদ ঠাকুরকে বাংলার অবহেলিত লোকায়ত সমাজের নবজাগরণের যথার্থ অগ্রদূত বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে দাবি করা যায়।

শ্রী শ্রীহরিচাঁদ-গুরুচাঁদ নেতৃত্বাধীন মতুয়াধর্ম সমাজ সংস্কার আন্দোলনের গতিশীল প্রবাহ বিশ্লেষণে এই তথ্য উদঘাটিত হয় যে কেবলমাত্র ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে হরি-গুরুচাঁদের প্রচেষ্টা ও উদ্যম নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, তা বর্তিত হয়েছে অনুন্নত জনগোষ্ঠীর আত্মজাগরণের ক্রমোন্নত প্রয়াসজনিত নব নব রূপান্তরের ধারায়। এই রূপান্তরের ধারা সূত্রাকারে নিম্নলিখিত রূপে বিন্যস্ত করা যায়-

(1)জাত-পাত বিরোধী সংগ্রাম রূপ নেয় ব্রাহ্মণ্য পুরোহিত তন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে।

(2) ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র বিরোধী আন্দোলন রূপান্তরিত হয় ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে।

(3) স্বতন্ত্র ধর্ম সংস্কার আন্দোলন রূপান্তরিত হয় সমাজ সংস্কার আন্দোলনে।

(4) সংস্কার আন্দোলন রূপান্তরিত হয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায়। পুনুরুতজ্জীবনের

(5) অর্থনৈতিক উন্নয়ন আন্দোলন প্রসারিত হয় রাজনৈতিক ও জাতীয় আন্দোলনে।

(6) মতুয়া আন্দোলন রূপ পরিগ্রহ করে নিপীড়িত সমাজের আত্মজাগরণের আন্দোলনে।[৩]

তাই বলা যায় জাত-পাত বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে যার প্রাথমিক সূত্রপাত, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে তা আর্থ-রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় এবং সৃষ্টি করে অবহেলিত সমাজের পুনুরুজ্জীবনের আন্দোলন। এইভাবে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ নেতৃত্বাধীন মতুয়া ধর্ম আন্দোলন

মূলত নমঃশূদ্র সমাজকে অবলম্বন করে উদ্ভূত হলেও কালক্রমে তা সমাজ সংস্কার ও স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় জাগরনের সার্থক পরিণীতির দিকে অগ্রসর হয় এবং সামগ্রিকভাবে সৃষ্টি করে অবহেলিত সমাজের নবজাগরণ।

তথ্য সুত্রঃ

১।শ্রী বরুণ কুমার ভক্ত, আলোর দিশারী শ্রীহরি-গুরুচাঁদঠাকুর, পৃষ্ঠা ৬)

২। হরেন্দ্র নাথ মন্ডল, পাঁচ মহামানবের ধর্মীয় দর্শন, বলাকা সমবায় আবাসন, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০২২,পৃষ্ঠা ৫২

৩। কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম আন্দোলন, নিখিল ভারত প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২,পৃষ্ঠা ৯৬)

গ্রন্থপঞ্জি:

1) তারক চন্দ্র সরকার, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত,(নবম সংস্করণ) ঠাকুরনগর ,২০১০

2) আচার্য মহানন্দ হালদার, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত (পঞ্চম সংস্করণ) ঠাকুরনগর ,২০১০

3) কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম আন্দোলন, নিখিল ভারত প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২

4) জগদীশচন্দ্র রায়, গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমাজ সংস্কার ও মুক্তির দিশা, হরিচাঁদ গুরুচাঁদ প্রকাশনী, মুম্বাই, ২০১৯

5) হরেন্দ্র নাথ মন্ডল, পাঁচ মহামানবের ধর্মীয় দর্শন, বলাকা সমবায় আবাসন, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০২২

6) শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস, মানব দরদী গুরুচাঁদ, সঞ্জীব কুমার চক্রবর্তী, কলকাতা ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

7) শ্রী বরুণ কুমার ভক্ত, আলোর দিশারী শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর, ২০১৭

8) রসময় বাইন, হরিচাঁদ ঠাকুরের দ্বাদশ আজ্ঞা ও হরি-গুরুচাঁদের অমীয় বাণী।

9) অধ্যাপক নরেশ চন্দ্র দাস, শ্রী হরিচাঁদ প্রসঙ্গে, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

10) ড. কিরনচন্দ্র চৌধুরী, ভারতের ইতিহাস কথা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ,১৯৯৮

11) ড. জি. কে.পাহাড়ি, ভারতের ইতিহাসের রূপরেখা, শ্রীতারা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬

12) গৌতম ভদ্র, নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কোলকাতা,২০১২